রবীন্দ্রনাথের কোয়ান্টাম ভাবনা ও প্রেমচেতনা

জহরুল হক

নির্জন নদীপাড়ে বসে আছে প্রবীন মাঝি। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। এক পথচারীর পায়ের শব্দে নিমগ্নতা ভাঙে। পথচারী প্রশ্ন করে, 'অ মিয়া, এই সাঁঝবেলায় মাথায় হাত দিয়া কী বাবতিছো অমন কইরা ?' কিছুক্ষণ আগে প্রবল ঝড়ে মাঝির মাল-বোঝাই নৌকাখানি গেছে তলিয়ে। সে পথচারীকে বলে, 'আগে আমারে একখান বিড়ি দাও, পরে কইতিছি কী বাবতেছিলাম ।' বিড়িতে টান দিয়ে মাঝি বলে, 'মালিকের নাও গেলো, তা বাবতিছিনা। মহাজনের মাল গেলো, তাও বাবতিছিনা। বাবতিছি, অ' আল্লা, ওলো কী!'

ছোটবেলায় গল্পটি বারকয়েক শুনেছি বাবার কাছে। তখন মাঝির এই কথাগুলির অর্থভেদ করতে পারিনি। বয়স বাড়ার সাথে বুঝতে পেরেছি যে প্রত্যেকটি মানুষই প্রকৃত অর্থে এক-একজন দার্শনিক। তা সে মাঝিই হোক, আর দিন-মজুরই হোক। অথবা যে কোনো পেশাই হোক না তার । স্কুল-কলেজে পড়ুক বা না-ই পড়ুক। কেননা, সে স্বাধীনভাবে, ইচ্ছামত চিন্তা করতে পারে। আর এই চিন্তার স্রোতই তাকে নিয়ে চলে চেতনার গভীর থেকে গভীরতর স্তরে- জগৎ দর্শনের পথে। জিজ্ঞাসা জাগে- কবে, কেন এবং কিভাবে সৃষ্টি হয়েছিলো এই মহাবিশ্বের?

বিজ্ঞানীদের অনুমান প্রায় ১৪০০ কোটি (14 billion) বছর আগে যে Big Bang মহাবিস্ফোরণ ঘটেছিলো তা থেকেই এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি, সম্ভবতঃ এক স্বয়ম্ভুত প্রাকৃতিক ক্রিয়াতে। সুফী-দার্শনিকের চেতনায় এই স্বয়ম্ভুত প্রাকৃতিক ক্রিয়াটি স্ব-ঘোষিত হয় মরমিয়া বাণীতে- "I was a hidden treasure and I wanted to be known, therefore I created the creation in order to be known." প্রশ্ন জাগে- সুফী-দার্শনিকের চেতনায় কে এই 'উত্তম পুরুষ (I)'?

উপনিষদে শ্বেতাশ্বতর মুনির চেতনায়, "সঃ বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিৎ আত্মযোনিঃ জ্ঞঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্ ...। (তিনি বিশ্বসৃষ্টা, বিশ্বজ্ঞাতা, স্বয়ম্ভু, কাল-প্রবর্তক, কালজ্ঞ, গুণী ও সর্বজ্ঞ ...)" নাট্যবিশারদ ভরতমুনি ভাবেন, "আঙ্গিকাম্ ভুবনম্ ইয়স্য বাচিকাম্ সর্ববাঙময়ম্, আহারিয়ম্ চন্দ্র-তারাদি, ... (তাঁর শরীরই হলো সমগ্র মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্বের সমস্ত শব্দ-তরঙ্গ তাঁরই মুখনিসৃত, চন্দ্র-তারকামন্ডলই তাঁর শরীরের অলঙ্কার ...)।" আর দার্শনিক বারুক্ স্পিনোজার চেতনায় এই বিশ্ব-প্রকৃতিই মূর্ত হয় সুফী-দর্শনের উত্তমপুরুষ-রূপে।

উপরের প্রশ্নোত্তরগুলির আসল উৎস হলো মানব-চেতনা। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাতে যা জানা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, মানুষের মস্তিকের স্নায়ু কোষের 'সাইনাপ্স' নামক সংযোগ স্থলগুলিতে যে বিশেষ জৈব-রসের খেলা চলছে তার থেকেই সৃষ্টি হয় এই চেতনা। সাইনাপ্স-ই হচ্ছে জৈববিবর্তনের আধুনিকতম পণ্য। শ্রেষ্টতমও বটে। মানব মস্তিকের ভিতরে সুন্দর এক পসরা সাজানো রয়েছে এই পণ্যসমুহের । আর এই পসরার ডালিই হলো মানুষের সর্ব চেতনার উৎসমুখ। সাইনাপ্সের রসক্রীড়ার দ্বারা আমরা যেমন চোখ দিয়ে দেখতে পাই, মন দিয়েও তেমন-ই দেখতে পারি । অ্যলবার্ট আইনস্টাইনের বিশ্বাস- "We do things with our mind, even in our everyday life, for which we are not responsible. The mind acknowledges realities outside of it. For instance, nobody may be in this house, yet the table remains where it is." কিন্তু কোয়ান্টাম বিজ্ঞান বলে- 'The very existence of any object is not independent of human observation'.

রবীন্দ্রনাথের চেতনায় কোয়ান্টাম ভাবনার স্পষ্ট পরিচয় পাই যখন তিনি আইনস্টাইনকে বলেন, "The world is a human world – the scientific view of it is also that of the scientific man. Therefore the world apart from us does not exist; it is a relative world, depending for its reality upon our consciousness."

তাঁর কোয়ান্টাম ভাবনা স্পষ্টতর হয় 'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতাটির শুরুতেই-

"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে ।
আমি চোখ মেললুম আকাশে -
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে ।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর' -
সুন্দর হল সে ।"

রবীন্দ্রনাথের এই কোয়ান্টাম ভাবনার সাথে যখন তাঁর ঈশ্বর-চেতনা এসে মেশে তখন শুনতে পাই, তিনি গাইছেন-

"হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান?

আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র তব বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি-
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।”

তাঁর কণ্ঠে আরো শুনি,

“আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।
আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।”

যদি Quantum Crush বা Big Crunch (যা Big Bang-এর প্রতিকূল)-এর মত বিধ্বংসী দুর্ঘটনা কখনো ঘটে, তবে কি-

“সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে।
তখন বিরাট বিশ্বভুবনে
দূরে দূরান্তে অনন্ত অসংখ্য লোকে লোকান্তরে
এ বাণী ধ্বনিত হবে না কোনোখানেই-
‘তুমি সুন্দর’,
‘আমি ভালোবাসি’।

বিস্ময় জাগে- সত্যিই যদি এমনটি ঘটে, গণিতের গণনায় যার সম্ভাবনার ইঙ্গিতও রয়েছে, তাহলে সেদিন-

“বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ’রে-
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন
‘কথা কও, কথা কও’,
বলবেন, ‘বলো, তুমি সুন্দর’,
বলবেন, ‘বলো, আমি ভালোবাসি’?”

আবার- “আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হত যে মিছে”–এই রকম শর্তনির্ভর প্রেমচেতনার বাইরে আর এক শর্তহীন মিস্টিক প্রেমচেতনাও জন্ম নেয় রবীন্দ্রমানসে, যখন বলেন,

“দূরদেশী সেই রাখাল ছেলে
আমার বাটে বটের ছায়ায় সারা বেলা গেল খেলে।
গাইল কী গান সেই তা জানে, সুর বাজে তার আমার প্রাণে-
বলো দেখি তোমরা কি তার কথার কিছু আভাস পেলে।
আমি তারে শুধাই যবে ‘কী তোমারে দিব আনি’-
সে শুধু কয়, ‘আর কিছু নয়, তোমার গলার মালাখানি।’
দিই যদি তো কী দাম দেবে যায় বেলা সেই ভাবনা ভেবে-
ফিরে এসে দেখি ধূলায় বাঁশিটি তার গেছে ফেলে।”

কোয়ান্টাম বিজ্ঞানী পল ডিরাক মন্তব্য করেছিলেন- “In science one tries to tell people, in such a way as to be understood by everyone, something that no one ever knew before. But in poetry it’s the exact opposite.” রবীন্দ্রনাথের গদ্যকাব্যের ক্ষেত্রে ডিরাকের মন্তব্যটি যথার্থ নয়। ‘পুনশ্চ’-এর ভূমিকাতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, “গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীনক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে।”

আসলে,

“পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।

তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী-কুশ্রী ভালোমন্দ তার আঙিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।”

তাঁর এই গদ্যকাব্যের আঙিনায় সত্যিই এলো সহজ-সুন্দর, জাগতিক-অথচ-মিস্টিক এক প্রেমচেতনা। ফার্সী ভাষায় তাঁতীকে বলে ‘জোলা’। বারাণসীর উপকণ্ঠে এক মুসলমান-জোলা পরিবারে প্রতিপালিত যুবক কবীর বৈষ্ণব-গুরু রামানন্দের শরণাপন্ন হলেন শাস্ত্র শিক্ষার জন্যে। কিন্তু মুসলমান ব’লে রামানন্দ তাঁকে শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন না। নাছোড়বান্দা কবীর ভোরের আলো ফোটার আগেই গিয়ে শুয়ে রইলেন গঙ্গার ঘাটের সিঁড়িতে। প্রাতঃস্নান সেরে রামানন্দ ঘাটের সিঁড়িতে উঠতে গিয়ে অন্ধকারে হোঁচোট খেলেন কবীরের গায়ে। ব’লে উঠলেন, “রাম, রাম”। কবীরের কানে গেলো সেই শব্দ। আর এইভাবে তখনই তাঁর অভিষেক হলো রামানন্দের শিষ্য হিসেবে। প্রচলিত এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথ নিলেন না। এক বিশুদ্ধ প্রেমচেতনায় তিনি রচনা করলেন নতুন গল্পের এক গদ্য কবিতা কবীর ও রামানন্দকে নিয়ে।

“রামানন্দ পেলেন গুরুর পদ-
সারাদিন তাঁর কাটে জপে তপে,
সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরকে ভোজ্য করেন নিবেদন,
তারপরে ভাঙে তাঁর উপবাস
যখন অন্তরে পান ঠাকুরের প্রসাদ।
সেদিন মন্দিরে উৎসব-
রাজা এলেন, রানী এলেন,
এলেন পণ্ডিতেরা দূর দূর থেকে,
এলেন নানা চিহ্নধারী নানা সম্প্রদায়ের ভক্তদল।

সন্ধ্যাবেলায় স্নান শেষ করে
রামানন্দ নৈবেদ্য দিলেন ঠাকুরের পায়ে-
প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে,
আহার হল না সেদিন।

এমনি যখন দুই সন্ধ্যা গেল কেটে,
হৃদয় রইল শুষ্ক হয়ে,
গুরু বললেন মাটিতে ঠেকিয়ে মাথা,
‘ঠাকুর, কী অপরাধ করেছি।’
ঠাকুর বললেন, ‘আমার বাস কি কেবল বৈকুণ্ঠে ।
সেদিন আমার মন্দিরে যারা প্রবেশ পায় নি
আমার স্পর্শ যে তাদের সর্বাঙ্গে,
আমারই পাদোদক নিয়ে
প্রাণপ্রবাহিণী বইছে তাদের শিরায়।
তাদের অপমান আমাকে বেজেছে;
আজ তোমার হাতের নৈবেদ্য অশুচি।’

‘লোকস্থিতি রক্ষা করতে হবে যে প্রভু’
ব’লে গুরু চেয়ে রইলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।
ঠাকুরের চক্ষু দীপ্ত হয়ে উঠল; বললেন,
যে লোকসৃষ্টি স্বয়ং আমার,
যার প্রাঙ্গণে সকল মানুষের নিমন্ত্রণ,
তার মধ্যে তোমার লোকস্থিতির বেড়া তুলে
আমার অধিকারে সীমা দিতে চাও
এতবড়ো স্পর্ধা!’
রামানন্দ বললেন, ‘প্রভাতেই যাব এই সীমা ছেড়ে,
দেব আমার অহংকার দূর করে তোমার বিশ্বলোকে।’

তখন রাত্রি তিন-প্রহর,
আকাশের তারাগুলি যেন ধ্যানমগ্ন।
গুরুর নিদ্রা গেল ভেঙে; শুনতে পেলেন,
‘সময় হয়েছে, ওঠো, প্রতিজ্ঞা পালন করো।’
রামানন্দ হাতজোড় করে বললেন, ‘এখনো রাত্রি গভীর,
পথ অন্ধকার, পাখিরা নীরব।
প্রভাতের অপেক্ষায় আছি।’
ঠাকুর বললেন, ‘প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,

তখনি এসেছে প্রভাত।
যাও তোমার ব্রতপালনে।’

রামানন্দ বাহির হলেন পথে একাকী,
মাথার উপরে জাগে ধ্রুবতারা।
পার হয়ে গেলেন নগর, পার হয়ে গেলেন গ্রাম।
নদীতীরে শ্মশান, চণ্ডাল শবদাহে ব্যাপৃত।
রামানন্দ দুই হাত বাড়িয়ে তাকে নিলেন বক্ষে।
সে ভীত হয়ে বললে, ‘প্রভু আমি চণ্ডাল, নাভা আমার নাম,
হেয় আমার বৃত্তি,
অপরাধী করবেন না আমাকে।’
গুরু বললেন, ‘অন্তরে আমি মৃত, অচেতন আমি,
তাই তোমাকে দেখতে পাই নি এতকাল,
তাই তোমাকেই আমার প্রয়োজন-
নইলে হবে না মৃতের সৎকার।’

চললেন গুরু আগিয়ে।
ভোরের পাখি উঠল ডেকে,
অরুণ-আলোয় শুকতারা গেল মিলিয়ে।
কবীর বসেছেন তাঁর প্রাঙ্গণে,
কাপড় বুনছেন আর গান গাইছেন গুন গুন স্বরে।
রামানন্দ বসলেন পাশে,
কণ্ঠ তাঁর ধরলেন জড়িয়ে।
কবীর ব্যস্ত হয়ে বললেন,
প্রভু, জাতিতে আমি মুসলমান,
আমি জোলা, নীচ আমার বৃত্তি।’
রামানন্দ বললেন, ‘এতদিন তোমার সঙ্গ পাই নি বন্ধু,
তাই অন্তরে আমি নগ্ন,
চিত্ত আমার ধূলায় মলিন,
আজ আমি পরব শুচিবস্ত্র তোমার হাতে-
আমার লজ্জা যাবে দূর হয়ে।’

শিষ্যেরা খুঁজতে খুঁজতে এল সেখানে,
ধিক্কার দিয়ে বললে, ‘এ কী করলেন প্রভু।’
রামানন্দ বললেন, ‘আমার ঠাকুরকে এতদিন যেখানে হারিয়েছিলুম
আজ তাঁকে সেখানে পেয়েছি খুঁজে।’
সূর্য উঠল আকাশে
আলো এসে পড়ল গুরুর আনন্দিত মুখে।”

রবীন্দ্রনাথের আর এক প্রেমচেতনার পরিচয় পাই যেখানে মানবিক প্রেম সামাজিক নীতিবোধের হাতে বারবার নিদারুণভাবে আহত হয়েও অপরাজেয়। এই প্রেমচেতনাটি মূর্ত হয় কবির ৭৮ বছর বয়সের রচনা ‘শ্যামা’ গীতিকাব্যখানিতে।

গৌতম বুদ্ধ জন্মেছিলেন প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে কপিলবস্তু নগরীতে। যশোধরা নামে এক সুন্দরী কিশোরীর সাথে গৌতমের বিয়ে হয় ১৬ বছর বয়সে। মাত্র ২৯ বছর বয়সে স্ত্রী যশোধরা ও শিশু পুত্র রাহুলকে ছেড়ে গৌতম কেন গৃহত্যাগ করেছিলন সেই আখ্যানটি আমরা পাই ‘The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal’ নামক গ্রন্থ থেকে। আখ্যানটিতে বলা হয়েছে- বহুকাল আগে গৌতম একবার জন্মেছিলেন তক্ষশীলাতে। নাম ছিলো বজ্রসেন। তার পেশা ছিলো অশ্ব-বেচাকেনা। একই সময়ে বারাণসীতে জন্মেছিলেন যশোধরা। নাম ছিলো শ্যামা। পেশায় সে ছিলো অগ্রগণিকা (the first public woman in Banaras) এবং রাজনটী।

একদিন ব্যবসা উপলক্ষে বারাণসী যাবার পথে বজ্রসেন পড়লো দস্যুর হাতে। ঘোড়াতো গেলোই, দস্যুর হাতে বেদম মারও খেলো। বারাণসীতে পৌঁছে শ্রান্ত বজ্রসেন বিশ্রাম করছে গাছের ছায়ায়। এমন সময়ে রাজপ্রহরী তাকে গ্রেপ্তার করলো রাজকোষে চুরির অভিযোগে। অভিযোগ সত্যি নয়। তবুও বিচারে তার প্রাণদণ্ড সাব্যস্ত হলো। অচিরেই বজ্রসেনের সাথে দেখা হলো শ্যামার। আর সৌম্যকান্তি বজ্রসেনকে দেখামাত্রই শ্যামা পড়লো তার প্রেমে। তখনই বজ্রসেনকে বাঁচানোর এক উপায়ও স্থির করে ফেললো সে। কিশোর বালক উত্তীয় শ্যামার একনিষ্ঠ ভক্ত ও অন্ধ-প্রেমিক। উত্তীয়ের প্রাণের বিনিময়ে বাঁচলো বজ্রসেনের জীবন। তারপর প্রেমের জোয়ারে ভেসে চললো দুটি প্রাণ শ্যামা আর বজ্রসেন অজানা ভবিতব্যের পানে। পরে বজ্রসেন জানতে পারলো কী উপায়ে সে মুক্ত হয়েছে। সে তখন ধিক্কার দিতে লাগলো শ্যামাকে। শ্যামার সান্নিধ্য অসহনীয় হয়ে উঠলো তার। সে শ্যামাকে পরিত্যাগ করতে চাইলো। মদ্যপানে-অচেতন শ্যামাকে

নদীতে নিক্ষেপ করলো। করুণাবশে আবার পরক্ষণেই তাকে তুলে নদীর ঘাটে রেখে রওনা হলো তক্ষশীলার পথে। শ্যামা তখনও মরেনি। সে সুস্থ হয়ে উঠলো তার মায়ের শুশ্রূষায়। আর অচিরেই তক্ষশীলার এক ভিক্ষুনী মারফত বজ্রসেনকে পাঠালো তার আকুল হৃদয়ের বার্তা। সাথে মিলনের আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ এই আখ্যানটিকে নিয়ে চিত্রায়ন করলেন এক নতুন শ্যামাকে। উত্তীয় যখন এই শ্যামাকে বলে-

"ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে, জানিনে,
শুধু তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।
চাও কি প্রেমের চরম মূল্য- দেব আনি
দেব আনি ওগো সুন্দরী। "

তখন মানব-মানবীর প্রেম এক অতিমানবিক, মিস্টিক রোমান্সের রসে নন্দিত হ'তে থাকে। সে-প্রেম ন্যায়নীতিবোধের ধারপাশ স্পর্শ করেনা। রবীন্দ্র-প্রেমিক আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন, 'এ দুর্লভ প্রেম'।

শ্যামা যখন বজ্রসেনকে বলে যে তারই অনুরোধে উত্তীয়-

"চুরি অপবাদ
নিজ- 'পরে লয়ে
সঁপেছে আপন প্রাণ,"

শুরু হয় বজ্রসেনের মানসিক দ্বন্দ। শ্যামাকে তীব্র ধিক্কার দেয় সে। পরিত্যাগ করতে চায় তাকে। কিন্তু শ্যামা বজ্রসেনকে ছাড়তে চায় না। তখন বজ্রসেন শ্যামাকে কঠোর আঘাত করে এবং মৃত-প্রায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে তাকে। পরক্ষণেই সে তীব্র অনুতাপে দগ্ধ হ'তে থাকে। সে ভুলতে পারেনা শ্যামার ভালোবাসাকে। মৃত্যুলোক থেকে ডাকতে থাকে তাকে। দয়িতের সেই ডাকে সাড়া দেয় শ্যামা। সে বলে, "তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিলো, নাথ । তাই মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছি তোমার কাছে। আমাকে ক্ষমা করো, প্রিয়তম।"

এই প্রসঙ্গে আইয়ুব বলছেন, "মনে হয় এই নীতিগর্ভ অথচ নীতিপারের নাটকে মানব জীবনের অতি দুর্বোধ্য জটিলতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ আটাত্তর বৎসরের বহু বিচিত্র বেদনায় দগ্ধ রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চাইছেন- মানুষকে হৃদয়

দিয়ে বোঝো - ছককাটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চেয়ো না"। সেই বিখ্যাত ফার্সী প্রবাদের অনুরণন- 'সব বুঝতে পারা মানে সব ক্ষমা করা'।

বজ্রসেনের মনে আবার জাগে সেই দ্বন্দ। প্রিয়তমাকে ক্ষমা করতে পারে না সে। বলে, "যাও যাও যাও যাও, চলে যাও"। শ্যামা চলে যায়। বজ্রসেন দগ্ধ হ'তে থাকে তীব্রতর অনুতাপে। শেষে সে ঈশ্বরকে জানায় প্রিয়তমাকে ক্ষমা করতে না-পারার নিষ্ঠুর মর্ম-যন্ত্রণা–

"ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো হে মম দীনতা-
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা,
ক্ষমো হে মম দীনতা।
পাপীজনশরণ প্রভু।
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে, প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো, তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না আমার ক্ষমাহীনতা।"

* * *

July 15, 2012
34411 Summerset Drive
Solon, Ohio 44139
United States of America
Email: haquej@ccf.org